অ নি র্বা ণ সি ন্ হা

দেরিদা-নাগার্জুন কাল্পনিক কথোপকথন

প্রস্তাবনা

স্থান : পাকিস্তানের স্বোয়াত উপত্যকা

কাল : ২০১৩ সালের শীতের একটি অপরাহ্ন

পরিপ্রেক্ষিত : বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) ও ফরাসি উত্তর আধুনিক দার্শনিক জ্যাক দেরিদা একটি আঙুর বাগিচায় বসে কথোপকথনে রত। গত সন্ধ্যায় একটি ড্রোন হামলায় এই গ্রামের পঁচিশজন অধিবাসী নিহত হয়েছে। মার্কিন সেনার দাবি অনুযায়ী, প্রত্যেকেই জঙ্গি। যদিও এই দুই দার্শনিক গত দু'বছর এই গ্রামে বসবাসের সূত্রে জানেন, নিহতদের মধ্যে পাঁচটি শিশু, তেরো জন মহিলা, তিনজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও চারজন পুরুষের কেউই কস্মিনকালে হাতে একটা ছর্‌রা বন্দুকও ধরেনি।

কৈফিয়ত : সময়ের বিচারে বৌদ্ধ নাগার্জুন, উত্তর আধুনিক দেরিদার তুলনায় প্রায় আড়াই হাজার বছরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ। তাই কথোপকথনে দেরিদা, নাগার্জুনকে 'আপনি' এবং নাগার্জুন দেরিদাকে 'তুমি' বাচ্যে সম্বোধন করেছেন।

দেরিদা-নাগার্জুন সংলাপ

দেরিদা : মিছিলটা দেখছেন? গত দু'দিনে এটা বোধহয় কুড়ি নম্বর মিছিল! শুধু একের পর এক মৃতদেহ আসছে আর যাচ্ছে!

নাগার্জুন : হ্যাঁ। এই ড্রোন অস্ত্রটা ঠিক কী বলতো বাপু? গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজত্বে আমি অনেক যুদ্ধ দেখেছি। অনেক মানুষকে যুদ্ধে মরতেও দেখেছি। তবে এমন ভয়ংকর মানুষ মারা অস্ত্র দেখিনি! এমন অন্ধ অস্ত্রও দেখিনি। জঙ্গি, আধা-জঙ্গি, নিতান্ত ছাপোষা গেরস্ত—সাঁই করে এসে পড়ছে আর নির্বিচারে মারছে!

দেরিদা : ধর্ম বস্তুটা কী ভয়ঙ্কর সব্বনেশে দেখছেন তো? আজকাল গোঁড়া ক্রিশ্চান দেখলে ভয় হয়, ব্যাটা হিটলারের রি-বার্থ নয় তো? আমেরিকার বাপ বুশ আর ব্যাটা বুশই বা কম যায় কীসে! আর মুসলিম? আপনি মানুন আর নাই মানুন, গোটা পশ্চিমি সভ্যতা এখন মনে করে মসজিদগুলোয় জেহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, আর মুসলিম মানেই লাদেন বা জাওয়াহিরি! যদিও আমি এমন অতি-সরলীকরণ আর প্রাচ্য সভ্যতা সম্পর্কে মূর্খতায় বিশ্বাসী নই; কিন্তু, আমি বা আমার মতো লোকেরা ইউরোপে এখন নিতান্তই সংখ্যালঘু। ইউরোপ, আমেরিকায় ক্রিশ্চানরা এখন গুড ফ্রাইডের দিন কোনও ইহুদির বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে পারে, তবু কোনও মুসলিমের সঙ্গে মেট্রোর পাশের সিটে বসে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে চায় না! এ সবের মূলে আসলে কিন্তু, ধর্ম।

নাগার্জুন : দোষটা ধর্মের ঘাড়ে চাপিও না! সভ্যতার ঘাড়ে, অন্ততপক্ষে সংস্কৃতির ঘাড়ে চাপাতে পারো। কিন্তু, ধর্ম নয়।

দেরিদা : কেন, ধর্ম নয় কেন?

নাগার্জুন : এই তোমাদের এক দোষ! ওই সঈদ ছোকরা (এডওয়ার্ড সঈদ) যাকে ওরিয়েন্টালিজম বলেছে! ধর্ম ব্যাপারটা সকলের কাছে রুজি-রুটি নয়, অনেকের কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। প্রথমটা জীবনধারণের উপায়, পরেরটা জীবনের লক্ষণ।

দেরিদা : বেশ। একটু বুঝিয়ে বলুন তবে, এই জীবনের লক্ষণটা ঠিক কী রকম! ইরাক, আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে যা বলছে একদিকে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অন্যদিকে খ্রিস্টের নামে তাকে আপনি ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন বলতেই পারেন, কিন্তু, সঙ্গে ফুটনোট দিয়ে লিখতে হবে, এটা সেই সভ্য সমাজের কাজ, যারা ধর্মে বিশ্বাস করে!

নাগার্জুন : তাই বুঝি? তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দখলের সীমানা অনুযায়ী যারা ইউরোপটাকে দুভাগে ভাগ করল, জার্মানিতে রাতারাতি দুই ভাইয়ের বাড়ির উঠোন দু'দেশে পাঠিয়ে দিল একটা পাঁচিল তুলে, তাদের মধ্যে বুঝি শুধু ধর্মবিশ্বাসীরাই ছিল? ধর্মদ্রোহীরা, নাস্তিকরা ছিল না? যুদ্ধ চলাকালীন একটা দেশের সৈন্যবাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ ও দেশপ্রেমিক অংশটাকে কাতিনে গণকবর কারা দিয়েছিল, তারা তো অসৎ কুলাকের থেকে সৎ পাদ্রিকে শ্রমিকশ্রেণির পক্ষে বেশি বিপজ্জনক শত্রু মনে করত?

দেরিদা : পাশ্চাত্য অধিবিদ্যা গত আড়াই হাজার বছর ধরে যে স্বর্গ, ঈশ্বরের রাজ্য, মৃত্যুর পর পুরস্কারের অধিবিদ্যক জগতের ইউটোপিয়া রচনা করেছে, মার্কসবাদকে আপনার তার থেকে খুব বেশি পৃথক বলে মনে হয়? যে বিমূর্ততা অধিবিদ্যার বীজ, সেই বিমূর্ততা-ই তো মার্ক্সবাদের প্রাণভোমরা। সবাই একদিন

মাংস-ভাত খাবে ; যে নিরামিষাসী সেও খাবে বা খেতে বাধ্য হবে! এই কল্পনা কোনও বহুত্ববাদী করতে পারে? শ্রমিকশ্রেণিকে স্বপ্ন দেখানো হল। মৃত্যুর পর নয়, তার আগেই স্বর্গ নেমে আসবে এই ধরাধামে, সেখানে সবাই সমান খাবে, সমান পড়বে, সমান মাখবে। ভালো কথা। তার জন্য কী করতে হবে? না, শ্রমিকরা এক পা আগে যাবে আর শ্রমিক নেতারা দুই পা পিছে। কামান-বন্দুকের মুখে সর্বহারা রাষ্ট্র গঠনের স্বার্থে সর্বহারা প্রাণ দেবে। বিপ্লব নামক এই একতরফা আত্মহত্যার শেষে যে সর্বহারা রাষ্ট্র তৈরি হবে সেখানে সর্বহারার স্বার্থটা কারা দেখবেন? না, সর্বহারার নামে তাদের প্রতিনিধি স্বরূপ একটা পার্টি, তারপর পার্টির প্রতিনিধি স্বরূপ একটা কমিটি, তারপর কমিটির প্রতিনিধি স্বরূপ পাঁচটা লোক। সবশেষে, ওই পাঁচটা লোকের প্রতিনিধি স্বরূপ একটা লোক। পৃথকবস্তুর অভেদ সাধনের এমন চমৎকার উদাহরণ আর পাবেন?

নাগার্জুন : পৃথকবস্তুর অভেদ সাধন! সেটা কী ব্যাপার?

দেরিদা : ধরুন, আমাদের সামনের এই আঙুরগাছের একটা পাতা আর দূরের ওই দেবদারুগাছের পাতা। এ দুটো পাতার মধ্যে কোনও মিল নেই। অথচ, দুটোই পাতা। এমনকি আমার দেশের একটা অলিভ পাতার সঙ্গে আর একটা অলিভ পাতারও সম্পূর্ণ মিল নেই। আকার, আকৃতি, রং ইত্যাদি কিছু সাদৃশ্যের জন্য আমরা পৃথিবীর বা প্রকৃতির মধ্যে একটা 'আদর্শ পাতা' (দ্য লিফ)-র কল্পনা করে নিয়েছি। যার আদলে, যার গুণাবলি অনুসরণে অন্য সব পাতা তাদের 'পাতাত্ব' লাভ করেছে। তাই স্পষ্টতই বিসদৃশ হলেও অলিভ, দেবদারু, ফার্ন, আঙুর, ঘাস এগুলো সবই পাতা। আমাদের যাদৃচ্ছিক ও কষ্টকল্পিত একটা 'আদর্শ পাতা'-র আদলে এগুলোকেও আমরা 'পাতা' বলে দাগিয়ে দিয়েছি। প্রত্যেকটা আলাদা প্রজাতির গাছের পাতা একে অপরের থেকে ভিন্ন, একই গাছের দুটি পাতাও আলাদা, তবুও এই সব পৃথক পাতাগুলো এক 'অভেদ পাতা'র অদৃশ্য ছাঁচে ফেলা 'পাতা'। আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলো এভাবেই পৃথকবস্তুর অভেদ সাধনে, যাদৃচ্ছিক নামকরণে এক একটা রূপকে (মেটাফোর)-এ পরিণত। কামার, চামার, ইঞ্জিনিয়ার—সবাই শ্রমিক।

নাগার্জুন : হুঁ। ইন্টারেস্টিং! আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শনের সঙ্গে বেশ মিল আছে দেখছি। সবই নাকি সেই অভেদ ব্রহ্মের প্রতিরূপ। গোটা ব্রহ্মাণ্ডে নাকি এক অবিচ্ছেদ্য একত্ব। ওদিকে একটা ব্রহ্ম রাজার পা টিপে না-খেয়ে মরছে, আরেক ব্রহ্ম পা টিপিয়ে, অন্য ব্রহ্মের পেটে লাথি মেরে খাচ্ছে। তবু, রাজাও ব্রহ্ম, চাকরও ব্রহ্ম। মন্দিরে পুজো করা পুরোহিতও ব্রহ্ম, আবার মন্দিরের চাতালে যে কোনওদিন পা রাখতে পারবে না সেই অস্পৃশ্য মুচি, মেথর, চণ্ডালও ব্রহ্ম!

দেরিদা : তবেই বুঝুন। মার্কস-এঙ্গেলসও কম যান না। আমেরিকা-ইউরোপে যে ছেলেটা কাজ হারাল বা কাজটা পেল না স্রেফ এই কারণে যে, ওই কাজটা ভারতীয় একটা ছেলে অনেক কম মজুরিতে করে দেবে, সেই ছেলেটাও শ্রমিক; আবার ভারতীয় ছেলেটাও শ্রমিক। এদের স্বার্থ এক, এদের লক্ষ্যও এক। পৃথিবীতে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা! আপনাদের ব্রহ্ম এখানে

দেরিদা : আলবাৎ। প্লেটো থেকে মার্কস—একই অধিবিদ্যার জয়যাত্রা চলছে।

নাগার্জুন : তা বলে যিনি ধর্মকে 'আফিম' বললেন, তার মতবাদকে 'ধর্ম' বলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

দেরিদা : মার্কস-এর অসামান্য অবদান তিনটে ক্ষেত্রে। প্রথমত, কার্ল মার্কস পুঁজিবাদের সবচেয়ে নিখুঁত বিশ্লেষক এবং সবচেয়ে নির্মোহ ধারাভাষ্যকার। দ্বিতীয়ত, মার্কস শ্রমের যে বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছিলেন, সেটা আজও প্রাসঙ্গিক। এ সমস্যার সমাধান হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়া বা চিনও শ্রমের বিচ্ছিন্নতার সমস্যার সুরাহা করতে পারেনি। তৃতীয়ত, এই সূত্রেই শ্রেণি সংঘর্ষ আজও চলছে। যদিও সেই সংঘর্ষে আরও স্তর ও জটিলতা যুক্ত হয়েছে। কিন্তু, মার্কসও অধিবিদ্যার ফাঁদে পড়েছেন।

নাগার্জুন : দেখ, সোভিয়েত, চিন—যে দেশের কথাই বল, মার্কসকে কেবলমাত্র ফলিত মার্কসবাদ দিয়ে বিচার করাটাও বোধহয় ভুল হবে। যদিও ফলিত স্তরে, একটা দর্শনের গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গেই তার সাফল্যও কিছুটা নির্ধারিত হয়।

দেরিদা : ফলিত নয়। আমি মার্কসের নিজস্ব প্রতিজ্ঞার কথাই বলছি। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোয় ব্যবহৃত প্রথম প্রপার নাউন-টা আপনার মনে আছে?

নাগার্জুন : না, ঠিক... কী বল তো?

দেরিদা : ভূত! প্রথম বাক্যটা ছিল, 'ইউরোপ ভূত দেখেছে। কমিউনিজমের ভূত!' আমার মতে, ভূত শুধু ইউরোপকে না, মার্কসকেও তাড়া করেছিল। অধিবিদ্যার ভূত। আড়াই হাজার বছর ধরে, ইউরোপীয় অধিবিদ্যা যে সরলরৈখিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছে, মার্কসও সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন। সবাই জানত, একটা 'শেষ বিচারের' দিন আসবে। সেদিন 'পাপী'র শাস্তি আর 'পবিত্র'দের পরিত্রাণ হবে। আর সেটাই পৃথিবীর শেষ। মার্কস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু, নিজে কী করলেন? 'শেষ বিচারে'র বদলে তিনি একটা 'শেষ সমাজ ব্যবস্থা' প্রেডিক্ট করলেন। সাম্যবাদ। সেটাও গোটা পৃথিবী জুড়ে আসবে। সেটাও শেষতম—অর্থনীতি আর সমাজের নিয়মে। মার্কস, তাঁর মতো করে, এন্ড অফ হিস্ট্রি ঘোষণা করলেন। প্রতিক্রিয়াটা দেখুন! সোভিয়েত, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়তেই, ওই ফুকুয়ামা বলে লোকটা একটা বই লিখে ফেলল, *এন্ড অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান* বলে।

নাগার্জুন : আর?

দেরিদা : আরও একটা ভুল হয়েছিল। মার্কসের মতে, সাম্যবাদী সমাজে, স্টেট উইল উইদ্যর অ্যাওয়ে। অথচ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোয় প্রেসক্রিপশনটা কী? সর্বহারার একনায়কত্বের নামে একদলীয় একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা। যে সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে যাবেন, সেই সমাজতন্ত্রে একটা ভীষণ শক্তিশালী রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্র ঘুমোয় না। রাতেও পুলিস পাঠিয়ে দেখে আপনি ঘুমোচ্ছেন কি না! অথচ, তারপর নাকি রাষ্ট্রটাই থাকবে না। কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্র এভাবে নিজেকে ভেঙে ফেলে না, ফেলতে পারে না। যদি না সেটা ভিতর থেকে পড়ে গিয়ে থাকে, ডেনমার্কের মতো।

নাগার্জুন : ডেনমার্ক?!

দেরিদা : হ্যাঁ, ডেনমার্ক। 'Something has rotten in the state of Denmark'— ভুলে গেলেন?

নাগার্জুন : সে তো রাজতন্ত্র! আমার দেশের সাতবাহন রাজাদের মতো!

দেরিদা : হ্যাঁ, সেই সর্বশক্তিমান রাজতন্ত্র, যা মর্ত্যে, স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করত, সেটাও পড়ে গিয়েছিল। আর সেই পচন-সংবাদটি হ্যামলেটকে দিয়েছিল তার বাবার প্রেতাত্মা। ভূত! মার্কস-এর কমিউনিজমে যারা 'ভূত' দেখেছিল, তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে 'বর্তমান' থেকে 'ভূত' বানিয়ে ছাড়ল, এই স্ব-বিরোধ আর অধিবিদ্যক খাঁচাটাকে কাজে লাগিয়ে। মার্কস তো হেগেল-কে নিয়েছিলেন। হেগেলের মিস্টিসিজম কীভাবে তার রচনায় ঢুকে গেল, ভিতর থেকে পচিয়ে দিল, সে খবর দেওয়ার জন্য মার্কস কোনও সহৃদয় ভূতের দেখা পাননি।

নাগার্জুন : এও কি ভাষার খেলা?

দেরিদা : খেলাটা অধিবিদ্যার। ভাষা তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী বাহন। উপনিষদের ব্রহ্ম যেমন, লীলাচ্ছলে এক থেকে বহু হলেন, ঠিক সেভাবেই মার্কস সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রশৃঙ্খল ভেঙে ফেলার দায়িত্ব। আসলে কী জানেন, আপনি ঈশ্বর মানলেন কি না, সেটা কখনোই অধিবিদ্যক বিশ্বাসের মাপকাঠি নয়। অধিবিদ্যার ফাঁদটা পাতা আছে ভাষার মধ্যে।

সর্বহারা আর ব্রহ্মলাভ হল সর্বহারা রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা বা বিপ্লব। এবার বলুন যারা ব্রহ্মের স্বপ্ন দেখিয়ে সারাজীবন শূদ্রের গলায় পা দিয়ে খেয়েছে বা খাচ্ছে আর যারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়ে পলিটব্যুরোর মেম্বারদের জন্য আলাদা ফুটপাথ তৈরি করেছে, তাদের 'মোডাস অপারেন্ডি'-তে কোনও তফাৎ খুঁজে পাচ্ছেন? এও, একরকম পৃথগবস্তুর অভেদ জীবন বাঁকা হেসে)!

দেরিদা : আলবাৎ!

নাগার্জুন : কী রকম?

নাগার্জুন : (স্মিত হেসে) তাহলে বলছ, কমিউনিজমও একটা ধর্ম?

দেরিদা : যেমন ধরুন বাড়ি শব্দটা। আপনি যদি বলেন এর মানে চার দেওয়াল ও একটা ছাদ বিশিষ্ট ঘেরা জায়গা, তাহলে পরিবার, সংসার এসব অর্থে যখন বাড়ি কথাটা ব্যবহার করছেন তখন আপনার সংজ্ঞায়ণ ভুল প্রতিপন্ন হবে। আসলে বাড়িকে বাড়ি না-বলে শাড়ি, ছুরি, ঘড়ি—যা খুশি বলা যেত। আমাদের ইচ্ছা হয়েছে, তাই বাড়ি নাম দিয়েছি। অর্থকারক 'বাড়ি'-র সঙ্গে কৃত অর্থ; পরিবার, সংসার, চার দেওয়াল এক ছাদ বিশিষ্ট ঘেরা জায়গা—এসবের কোনও মিল নেই। শব্দ ও তার কৃত অর্থ আসলে শূন্য। এটাই অধিবিদ্যার ফাঁদ।

নাগার্জুন : দেখ, এই কথাটাই আরও বিস্তৃত করে, আড়াই হাজার বছর আগে আমি বলেছি। তখন অনেকে ভুল বুঝেছে, কেউ বা ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটিয়েছে।

দেরিদা : সেটা কী-রকম?

নাগার্জুন : আমি বলেছিলাম, সব বস্তুই নিঃস্বভাব। অর্থাৎ, কোনও বস্তুরই নিজস্ব কোনও স্ব-ভাব নেই। সেই অর্থে এই বস্তুজগৎ স্বভাবশূন্য। যা আছে, তা এক শূন্যতা। আমার বিরুদ্ধবাদীরা বলতে শুরু করল, আমি নাকি ব্যবহারিক পৃথিবী, তার দুঃখ-কষ্ট এসব কিছুকেই অস্বীকার করেছি। আমি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের লোক। বামুনের ঘরে জন্মে পরে বৌদ্ধ হয়েছিলাম বলে উত্তরাপথের বামুনদের এমনিই বেশ রাগ ছিল আমার ওপরে। এরপর আমার দর্শনটা নিয়ে ওরা যাচ্ছেতাই শুরু করল। মধ্যমককারিকা, বিগ্রহব্যবর্তনী—নিজের এসব রচনার টীকা আমি নিজেই রচনা করলাম। তবু কুৎসা থামল না। শেষে প্রায় সাত-আটশো বছর পর কেরালার এক নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ ছোকরা, ওই শঙ্কর না কী যেন নাম; সে আমার শূন্যতার জায়গায় 'মায়া' বলে একটা শব্দ বসিয়ে, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' প্রচার করে গোটা ভারত কব্জা করল। তখন কিন্তু, উত্তরাপথের বামুনগুলো একটুও নাক সিঁটকোয়নি। তবে আমি এর জন্য কোনও কৃতিত্ব চাই না। শঙ্কর যা করেছে, সেটা আমার দর্শনের বিকৃতি।

দেরিদা : বিকৃতিটুকু যদি বাদও দিই, আপনার দর্শনেও একটা অধিবিদ্যক ঝোঁক পাচ্ছি যেন! সব বস্তু যদি নিঃস্বভাব হয় তবে আপনার বিবৃতি অনুযায়ীই আপনার এই বিবৃতিটাও নিঃস্বভাব অতএব শূন্য হয়ে পড়ছে না কি?

নাগার্জুন : আমার বিবৃতিটা যদি স্ব-ভাব যুক্ত হয়, অর্থাৎ এটা যদি একটা সদর্থক প্রতিজ্ঞা হয় তবে আমার বিবৃতিটাই খণ্ডিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে, অন্তত একটা বস্তু; আমার বিবৃতিটা নিঃস্বভাব নয়। অতএব, আমার বিবৃতি অনুযায়ী সব বস্তু নিঃস্বভাব নয়। অন্যদিকে, আমার বিবৃতি অনুযায়ীই যদি আমার বিবৃতিটা নিঃস্বভাব বা শূন্য হয়ে পড়ে তাহলে আমার বিবৃতির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

দেরিদা : এ তো ভারি অদ্ভুত! নিজেকে খণ্ডন করে আত্মপ্রতিষ্ঠা!

নাগার্জুন : এটাই তোমাদের আর আমাদের পার্থক্য। তোমরা প্রাণপণে হতে চাইছ। আমাদের সাধনা না-হওয়ার।

দেরিদা : সে যদি বলেন, অমন সদ্‌বস্তুর সততা অস্বীকার করায় আমাকেও ইউরোপে নিহিলিস্ট বা বিনাশবাদী বলে।

নাগার্জুন : এখানেই তোমার-আমার পার্থক্য। তুমি সদ্‌বস্তুর সততা অস্বীকার করছ। আমি কিন্তু, তা করিনি। আমি বলেছি, বস্তু সৎ, বস্তু অসৎ, বস্তু সৎ-অসৎ উভয়, বস্তু না-সৎ, না-অসৎ—এর কোনওটাই নয়।

দেরিদা : এ তো পার্থিব জগৎকেই অস্বীকার করা! শঙ্কর তবে বিকৃতি করলেন কোথায়?

নাগার্জুন : আমি জগৎকে অস্বীকার করিনি। আমি বলেছি, সকল পদার্থই প্রতীত্য সমুৎপন্ন। অর্থাৎ, কার্য-কারণ সম্পর্কে তার উৎপত্তি। যেহেতু হেতু-প্রত্যয় সম্পর্কে পদার্থসমূহ উৎপন্ন সেহেতু সকল পদার্থই সাপেক্ষ সত্তা। নিরপেক্ষ সত্তাবিশিষ্ট কোনও পদার্থ নেই। এই সাপেক্ষ সত্তাকেই আমি স্ব-ভাব শূন্যতা বলেছি। সমস্ত পদার্থের এই সাপেক্ষ সত্তা বর্তমান। আমি এই ব্যবহারিক সত্তাকে তো শূন্য বলিনি! আমি শুধু বলেছি যেহেতু সকল পদার্থই অন্য পদার্থ সাপেক্ষে উৎপন্ন, তাই স্ব-ভাব, স্ব-উৎপন্ন কোনও পদার্থ নেই। এই স্ব-ভাব হীনতাই আমার বচনে শূন্যতা। আমার বচনে সদ্‌, অসদ্‌, কোনও কিছুকেই খণ্ডন করতে যাওয়ার অর্থ, আগে স্বীকার, পরে অস্বীকার। আমি স্বীকার করিনি, তাই অস্বীকারের প্রশ্ন নেই।

দেরিদা : এবার বুঝলাম। এটা আমিও ভাষার বিষয়ে করেছি। এ ব্যাপারে আমি একমত।

নাগার্জুন : কী করেছ? ভাষার শূন্যতা প্রতিষ্ঠা?

দেরিদা : ওই যে বললাম, শব্দের নিজস্ব অর্থশূন্যতা।

নাগার্জুন : (মিটিমিটি হেসে) শব্দ যদি অর্থশূন্যই হবে, তবে, তুমি আমি কথা বলছি কী করে? অর্থবোধ হচ্ছে বলেই তো?

দেরিদা : ওইখানেই তো মজা! 'আমি তোমার বাড়ি যাব।' এই বাক্যতে আলাদা করে প্রত্যেকটা শব্দের কোনও অর্থ নেই। তা সত্ত্বেও এই বাক্যের মধ্যে প্রতিটি শব্দ অন্য একটা, দুটো বা তিনটে শব্দের সঙ্গে একটা পারস্পরিক নির্ভরশীল ও স্বতঃপরিবর্তনশীল অর্থশৃঙ্খল তৈরি করছে। এই বাক্যটায়, 'আমি'-র সঙ্গে 'তোমার', 'তোমার'-এর সঙ্গে 'বাড়ি', 'বাড়ি'র সঙ্গে 'যাব'—এক অদ্ভুত শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে অর্থরচনা করছে। পৃথকভাবে প্রত্যেকটা শব্দের অর্থকারক আর কৃত অর্থের কোনও যোগ নেই। সেই অর্থে শব্দগুলো আলাদা করে অর্থশূন্য। কিন্তু, এই বাক্যের নির্দিষ্ট শৃঙ্খলে অর্থবহ। প্রতিটা শব্দ আগের শব্দ থেকে এক-ভগ্নাংশ অর্থ গ্রহণ করছে, আবার পরবর্তী শব্দকে এক-ভগ্নাংশ অর্থ দান করছে। গ্রহণের মুহূর্তে যে কোনও শব্দ জীবিত, অন্যগুলো মৃত বা তাদের জীবনীশক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে। যেমন ধরুন, যখন 'আমি' উচ্চারিত হচ্ছে তখন অনাগত 'তোমার' সুপ্ত জীবনীশক্তি নিয়ে অপেক্ষমান।

আবার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'আমি' শব্দটা অতীত ও মৃত এবং পরবর্তী শব্দ 'তোমার'-এর ভগ্নাংশ অর্থের দাতা। 'তোমার'-এর মধ্যে 'আমি' নেই, অথচ, 'আমি'র উচ্চারণ ও লয় সুনিশ্চিত করে, 'তোমার'-এর সাময়িক উপস্থিতি।

নাগার্জুন : প্রতীত্য সমুৎপাদ। অস্মিন গতি ইদং ভবতি। এটির ইতি হচ্ছে, অন্যটির জন্ম হচ্ছে। আবার ইতি, পরেরটির জন্ম। এটাই গৌতম বুদ্ধের হেতু-প্রত্যয়বাদ আর ক্ষণিকত্ববাদ। তবে আমরা এটা বস্তুর সৃষ্টি-বিনাশে ব্যবহার করেছি।

দেরিদা : সেটা কী রকম?

নাগার্জুন : ধরো, তোমার এই শরীরটা। পাঁচ বছর বয়সে যেমন ছিল, এখন কি তেমন আছে? আকারে, প্রকারে কিছুই এক নেই। তবু তোমার স্বজন-বন্ধুরা চিনে তো নেয়! কী করে? তোমার শরীর প্রতিমুহূর্তে মরে, নতুন শরীরের জায়গা করে দিচ্ছে, তার সৃষ্টির হেতু হয়ে থাকছে। তোমার মানসিক বৃত্তিগুলোর ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটছে। বীজ পুঁতলাম মাটিতে, চারাগাছ হল, একদিন মহীরূহ হল। সেই মহীরূহে ওই বীজটা আছে বললেও ভুল হবে, নেই বললেও ভুল হবে।

দেরিদা : মৃত্যুর পর? গাছ না-হয় ফল দিল, বীজ ছড়িয়ে গেল। মানুষ মরার পর কোথায় যায়? আপনারা কী বলেন?

নাগার্জুন : আগুন নেভার পর কোথায় যায় বল দেখি?

দেরিদা : কোথায় আবার যাবে? কাঠ ফুরোলে, জ্বালানি ফুরোলে আগুন তো আপনেই নিভে যায়। জ্বালানি শেষ, জ্বলনও শেষ!

নাগার্জুন : ঠিক তাই। মানুষও মরলে শেষ। আবার অন্য একটা মানুষের শুরু। যেটা শেষ হয়, সেটাই শুরু হয় না। তবুও মনে হয়, একই জীবন চলছে। আসলে একটা অসন্তত সন্ততি (ডিসকন্টিনিউয়াস কন্টিনিউটি)।

দেরিদা : বলেন কী? আপনারা ধর্ম মানেন! এদিকে বলছেন মরলে সব শেষ? তবে তো ভালো-মন্দের দাম থাকবে না! সব শূন্য হয়ে যাবে। শোষক-শোষিতের একই গতি? মরলে শেষ?

নাগার্জুন : একটু আগে তুমিই তো বললে, শব্দ অর্থশূন্য। নিঃস্বভাব। ভালো-মন্দ তো স্বভাব যুক্ত, স্ব-উৎপন্ন নয়! এও তো হেতু-প্রত্যয়জনিত কারণে উৎপন্ন হয়, বিনষ্ট হয়। ভালো মানুষও মরে, খারাপ মানুষও মরে। এগুলির মধ্যে কোনও স্বভাব থাকলে মানুষ তো বিগ্রহের গায়ে গা-ঘষলেই ভালো হয়ে যেত। অথবা মন্দ লোকের ছেলে-মেয়ে সবসময় মন্দ হত।

দেরিদা : ধরুন, একটা লোক সারাজীবন সৎপথে থেকে না-খেয়ে মারা গেল, আর একটা লোক প্রচুর দুর্নীতি করে চল্লিশ বছর বয়সে ঘুমের মধ্যে মরে গেল। এদের কর্ম যে হেতু হয়ে থাকল, তার প্রত্যয় কী হবে?

নাগার্জুন : আগুন যদি জ্বালানি থাকা সত্ত্বেও ঝোড়ো হাওয়ায় বা বৃষ্টিতে নিভে যায় তাহলে অগ্নিসংযোগ করলে আবার জ্বলবে। তবে নতুন আগুনটার সঙ্গে

আগের আগুনটার কোনও যোগ থাকবে না। ওই যে বললাম, গাছের মধ্যে বীজ আছে, তবু গাছটা বীজের মতো দেখতে নয়। আমরা যাকে একটা জীবন বলে মনে করি বা একটা জীবন থেকে উদ্ভূত পরবর্তী জীবন ভাবি, সেটা আসলে অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন জীবনের পরপর শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে গড়ে ওঠা একটা ধারা যেটা অবিচ্ছিন্ন বলে ভ্রম হয়। তোমার, অর্থশূন্য শব্দ পরপর শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে অর্থযুক্ত বাক্যগঠনের মতো।

দেরিদা : তাহলে আপনারা জন্মান্তর মানেন?

নাগার্জুন : জন্মান্তর নয়, পুনর্জন্মও নয়, পরজন্ম মানি। ওই যে বললাম, একই লোক আবার জন্মায় না, যে ইন্ধনগুলো তৈরি আছে, তারা আগে জন্মানো এবং মরে যাওয়া একটা লোকের কর্ম, তার সংস্কার। কিন্তু, ওই লোকটা নয়। যে জন্মাবে সেও ওই লোকটা নয়। সোজা কথায় আমরা অনাত্মবাদী। অশাশ্বতবাদী। ভালো আর মন্দ—স্বতঃউৎপন্ন হলে, মানুষ ভালো হতে চেষ্টা করবে না, মন্দও হবে না। কিন্তু, তাই কি হয়? মানুষ নিজের চেষ্টায় খারাপ থেকে ভালো হয়, ভালো থেকে খারাপও হয়। আত্মা যদি নিত্য, বুদ্ধ, মুক্ত, শুদ্ধ হয় তবে চিত্তের সংস্কার আর কী হবে? সংস্কৃত জিনিষের সংস্কার হয় না কি? আমাদের ধর্মে সংস্কারের সুযোগ আছে। এ ধর্মের প্রধান কথা পরিবর্তন। ভালো-মন্দ সবই পরিবর্তনের ফলে ক্ষণিক উৎপন্ন।

দেরিদা : তা হলে নির্বাণ? সেটা কি স্ব-ভাব? আপনারা যে বলেন নির্বাণ মানে মুক্তি? সেটা তো একটা স্বতন্ত্র অবস্থা?

নাগার্জুন : না, হে! আমাদের নির্বাণ, ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মের মতো নয়, গাছে ফলে আছে, উঠে পেড়ে আনতে হবে। আমরা জগৎকে 'মিথ্যা' বলে, নির্বাণকে 'সত্যি' বলি না। সংসারের বিরুদ্ধ মেরুতে নির্বাণের অবস্থান নয়। কূটস্থ বস্তুসত্তার দিক থেকে নির্বাণে এমন কিছু নেই, যা সংসারে নেই। নির্বাণও সাপেক্ষ সত্তা, প্রতীত্য সমুৎপাদ। নির্বাণের জন্য চেষ্টা করলে, নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। তবে এটা গাছের ফল নয়, চেষ্টার ফল। পৃথিবীর বা বিশ্বজগতের কোথাও একটুকরো নির্বাণলোক আছে এমনটা নয়। যেহেতু নির্বাণও সাপেক্ষ সত্তা, সংসারও সাপেক্ষ সত্তা, উভয়েই হেতু-প্রত্যয়জনিত কারণে উদ্ভূত, স্ব-উৎপন্ন নয় তাই আমাদের কাছে নির্বাণের যে কোটি, সঞ্চরণশীল সংসার সেই একই কোটি—দু'য়ের মধ্যে কোনও সূক্ষ্মতম পার্থক্যও নেই।

দেরিদা : যাকে দুঃখমুক্তি বলছেন সেটাও যা, যাকে দুঃখের আধার বলছেন সেটাও তাই?

নাগার্জুন : ধরো, তোমার চোখে একটা চুল পড়েছে। তুমি জগতের সব জিনিসই কাটা কাটা, কালচে দেখবে। এমনকি সূর্যকেও বিভক্ত দেখতে পারো। তোমার চোখ থেকে চুলটা বার করা হল। এবার সব যেমনকার তেমন দেখবে। তা বলে তুমি কি বলবে, দ্বিখণ্ডিত সূর্য এবার অভেদ হল? অথবা, কাটা কাটা কালচে পৃথিবী এবার সুন্দর হল?

দেরিদা : কখনোই নয়। পৃথিবী ঠিকই ছিল। আমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল?

নাগার্জুন : এটা বলা যাবে কি, যে আগের পৃথিবীটা অসত্য আর এটা সত্য?

দেরিদা : না, না। তখনও যা ছিল, এখনও তাই আছে।

নাগার্জুন : নির্বাণ আর সংসারের মধ্যে তফাৎ হল দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ, পরাতাত্ত্বিক প্রভেদ (অন্টোলজ্যিকাল)। নির্বাণ কোনও অধিবিদ্যক সত্য নয় (যেমনটা ব্রহ্ম একটা মেটাফিসিক্যাল রিয়ালিটি)। এ শুধু দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ, কী জানছি তাতে তফাৎ হচ্ছে না, তফাৎ হচ্ছে শুধু কীভাবে জানছি তাতে।

দেরিদা : আপনাদের দেশে হিন্দুদের উপনিষদে নির্গুণ, নিরাকার, অভেদ, অদ্বৈত ব্রহ্মকে জানতে আর জানাতে রাশি রাশি শব্দের ব্যবহার। সেগুলো সব সদর্থক শব্দ। সুখ, আনন্দ, সচ্চিদানন্দ (সৎ, চিৎ, আনন্দ)। নির্গুণের প্রকাশ গুণ দিয়ে, এহ বাহ্য। অভেদ বোঝাতে, পরস্পর পৃথক অর্থবোধক একাধিক শব্দের ব্যবহার। যিনি এক, তাকে বোঝাতে, জানাতে বহুর ব্যবহার। আপনারা বৌদ্ধরা এদিক থেকে বেশ নিখুঁত মনে হচ্ছে। অর্থশূন্য শব্দ সহযোগে অর্থরচনার চেষ্টা নেই। ফলে, আপনাদের টেক্সট-এ ওই অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধটা নেই মনে হচ্ছে।

নাগার্জুন : তুমি যাকে পৃথগবস্তুর অভেদসাধন বলছ, যেটা তোমাদের পাশ্চাত্যে আড়াই হাজার বছর বলেছে, আমরা বৌদ্ধরা সেটা করিনি। শূন্যতা নিজে কোনও দার্শনিক সন্দর্ভ নয়, আমাদের কোনও প্রতিজ্ঞা নেই। শুধু অন্যান্য পরাতাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞাগুলোকে খণ্ডন করে আমরা দেখিয়েছি জগৎ অলীক নয়, তার ব্যবহারিক সত্যতা থাকলেও বস্তুজগৎ পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় সম্ভাবান। এতে লোভ কমে, প্রতিবেশীর সম্পত্তি হোক বা পররাজ্যের জমি হোক ; গ্রাস করার আগে মানুষ বা রাজা দু'বার ভাববে। যদি জানে, বস্তুজগৎ নিয়ত বিনাশশীল, অনিত্য, অশাশ্বত।

দেরিদা : কিন্তু, এই প্রতিজ্ঞা, এই জ্ঞানকে যদি কেউ অপরের ন্যায্য প্রাপ্য আটকানোর কাজে ব্যবহার করে? পুঁজিপতি যদি বলে, বিনাশশীল বস্তুজগৎ, ওহে শ্রমিক এত মজুরি নিয়ে কী করবে? এত লোভ কোরো না।

নাগার্জুন : তোমায় একটু আগেই বললাম না, শূন্যতাবোধ কোনও দার্শনিক সন্দর্ভ বা প্রতিজ্ঞা নয়। কোনও রোগীর পাকস্থলীর অসুখ সারাতে একটা অস্ত্রোপচার হল। এবার যদি সেই অস্ত্রোপচারের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অস্ত্রগুলোর কোনও একটা রোগীর পেটের ভিতর থেকে যায়? তবে কি সেই রোগীর অসুখ সেরেছে বলা যায়?

দেরিদা : কখনোই নয়। লোকটা আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বে। মরেও যেতে পারে।

নাগার্জুন : শূন্যতাদৃষ্টিও তাই। যদি শূন্যতাকে কেউ একটা পরাতাত্ত্বিক মতবাদ ভাবে তবে সে নিরাময় অযোগ্য। সবাই নৌকো চেপে নদীপার হয়। কাউকে দেখেছ, নদী পেরোনোর পর নৌকোটা কাঁধে নিয়ে স্থলভূমিতে হেঁটে যাচ্ছে?

দেরিদা (অট্টহাস্য) : অসম্ভব। তাও কি হয়?

নাগার্জুন : তোমার বাচনিক অবিনির্মাণ (Textual Deconstruction) আর আমাদের দার্শনিক অবিনির্মাণ-এর উদ্দেশ্য একই। স্ব-মত প্রতিষ্ঠা নয়। প্রচলিত অধিবিদ্যক দর্শনের স্বরূপ উন্মোচন। আমরা নিজেরাই নিজেদের টেক্সট-কে স্ব-ভাবশূন্য বলেছি। কোনও অপৌরুষেয়তার দাবি নেই।

দেরিদা : তাহলে, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তানের মানুষগুলোর কী হবে? পুঁজিবাদ এদের বোমা মারছে, সমাজতন্ত্র এদের আতঙ্ক। এরা এখন যায় কোথায়? আল্লাহ্, গড, ঈশ্বরকেও তো আমরা নস্যাৎ করে দিলাম! এদের নির্বাণ আর সংসার বলতে রইল কী?

নাগার্জুন : মানুষের লোভ আর পরমত অসহিষ্ণুতা যতদিন থাকবে ততদিন এটাই চলবে। কোনও শর্টকাট নেই। মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বৌদ্ধধর্ম, তার সংঘের দুর্নীতি আর ব্যাভিচারে ধ্বংস হয়েছে। না-হলে এই ওপারের জালালাবাদ্ পাহাড়ে গৌতম বুদ্ধের গ্রীবার অস্থিসহ স্তূপ ছিল। হাদাহ্ নামে তোমরা এখন যে জায়গাটা চেনো, আফগানিস্তানের সেই জায়গাটার নাম ছিল হাড্ডি-হাড্ডা। সেখানেও গৌতম বুদ্ধের শরীরের হাড় বা হাড্ডি ছিল। আমরা, যেখানে বসে আছি, এই স্বোয়াত উপত্যকার রাজা, বুদ্ধপ্রণাম না-করে রাজকার্য শুরু করত না। সেসব কোথায় গেল? *ক্যাপিটাল, কোরাণ, ত্রিপিটক*—সবই নিঃস্বভাব। মানুষ এই প্রকৃত শূন্য সংসারে, প্রেম করুণা, মৈত্রীর বারি সিঞ্চন করে তাকে শস্য-শ্যাম করে। মানুষ ছাড়া হবে না। বুদ্ধ না-হলেও চলবে, মানুষ লাগবে।

দেরিদা : শেষমেষ তবে জীবন মানে কী দাঁড়াল?

নাগার্জুন : জীবন মানে একটা ড্রাম। অনেকক্ষণ বাজালে, অনেক আওয়াজ হল, মানুষ আমোদ পেল, তুমি খুশি হলে। ড্রামের ওপরের আচ্ছাদনটা সরিয়ে দেখ। ভেতরটা ফাঁকা। তবুও ওই শূন্যস্থান থেকেই জীবনের শব্দ, ছন্দ, তাল, লয় নির্গত হচ্ছে। আচ্ছাদন সরালে নির্বাণ, আচ্ছাদিত রাখলে সংসার। উৎসমুখে শুধুই শূন্যতা।

অনির্বাণ সিনহা (sinhaanirban79@gmail.com) সাংবাদিক।